বাংলা নাট্য, হারানো প্রাপ্তি নিদ্দেশ

মনোজ মিত্র

উৎসবমুখর কলকাতা। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে তুলসী লাহিড়ির 'দুঃখীর ইমান'। সচরাচর প্রেক্ষাগৃহ শূন্যই থাকে, আজ উপচে পড়েছে। অভিনয়ের আগে নাট্যচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিভাষণ 'এ স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়',---সমবেত দর্শকের উৎসাহ - উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে দিলেন ভাদুড়িমশাই, 'ভুয়ো স্বাধীনতা, অস্ত্র এখনও মাউন্টব্যাটেনের হাতে।'

গ্রহ-নক্ষত্রের গতিস্থিতিসঞ্চার গণনা করেই নাকি স্বাধীনতা লাভের মাহেন্দ্রক্ষণটি বাছা হয়েছিল--- আগস্টের ১৪ আর ১৫ তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকায়। গণনা কতদূর নির্ভুল ছিল সে বিচারের দায় জ্যোতিষীর - তবে লগ্ন নির্বাচনের সঙ্গে ছিল আর এক রোমাঞ্চকর অনুভাবনা -- মধ্যযামে নিদ্রা ভেঙে ভারতবাসী শুনবে সেই পরমাশ্চর্য সংবাদটি--- তারা স্বাধীন। বাঙালির ক্ষেত্রে অবশ্যহিসাবটা মেলেনি। ঘুম থেকে জেগে উঠে তাকে খবরটা শুনতে হয়নি, যেহেতু তাঁরা কেউ বড় একটা সে রাত্রে শয্যায় যাননি। বলতে কি,স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তাঁরা বিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন--- দেশ কীভাবে ভাগ হতে চলেছে---কার ঘাড়ে কোপটা কীভাবে পড়তে চলেছে---সেই আতঙ্কে। কচুগাছ কাটার চেয়েও অনায়াসে ছেদন করা হল বঙ্গদেশ। রাত না পোহাতে দুদ্দাড় ছোটাছুটি---ছিন্নমূল মানুষের মিছিল ভারত - পাকিস্তানের সীমানা বরাবর -- যা আশঙ্কা, তাই শু হয়ে গেছে-- সাম্প্রদায়িক ডাণ্ডাগুলি খেলা। স্বধন স্বজন স্বভূমি হারানো স্বাধীনতার রোমাঞ্চ আজও কি পুরোপুরি থামল, পঞ্চাশ বছরেও ?

স্বাধীন দেশে বারো বছর বেঁচেছিলেন ভাদুড়িমশাই। বছর নয়েক কোনওমতে হাতে রাখতে পেরেছিলেন শ্রীরঙ্গম। দেনার দায়ে অবশেষে হারাতে হল। শেষের দিকে কোনও নাটকই তেমন জমছিল না তাঁর। 'মাইকেল', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিপ্রদাস' কিছুটা আর্থিকসাফল্য পেলেও, 'দুঃখীর ইমান', 'পরিচয়', 'প্রা', 'তখৎ-এ-তাউস' খরচের খাতায়। সহশিল্পীদের ওপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না ভাদুড়িমশাই। বুঝেছিলেন একটা টানতে হবে। নাটকগুলোতে তাই চলত যথেচ্ছ সংযোজন বিয়োজন। শেষ পর্যন্ত কেমন একটেরে হয়ে উঠত সেগুলো। মাঝেমধ্যে অসম্বন্ধ। যেমন ঘটেছিল যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী'র ক্ষেত্রে। অনেকটাই যে নাট্যকারের লেখা নয়, বেশ বোঝা যায়। তণ প্রজন্মও আকৃষ্ট করতে পারছিলেন না ভাদুড়িমশাই। তাঁর অভিনয়কলার প্রকাশবাদী রীতি, ক্ষণে ক্ষণে অন্তরমুখীহয়ে পড়ার মধ্যে যে নাটকীয় চমক - ক্রমশ জনাকর্ষণী লাগাম হারাচ্ছিল। লোকের ভাল লাগত বরং স্টারের শ্যামলীতে উত্তমকুমার সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অনুপকুমারদের ঘরোয়া আটপৌরে কথাবার্তা। ভাদুড়িমশাই বলতেন, ওসব সিনেমার ব্যাপার। থিয়েটারের অভিনয়েস্বাতন্ত্র্য থাকবে, থাকতে বাধ্য, যেহেতু স্থানীয় কালকি সীমাবদ্ধতায় থিয়েটার - খুব ঘরোয়া কথাবার্তায় তেজ তীক্ষ্ণতা এবং দংশনের ক্ষমতা থাকবে না, দর্শকের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে বেরিয়ে যাবে। থিয়েটার আর যা হোক সিনেমা তো নয়। বাংলা নাট্য ইতিহাসের এক ত্রান্তিকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ি বাংলা নাট্যের দুটো বড় দিকপরিবর্তন দেখে গেছেন। --- একটি চল্লিশের দশকের গোড়ায় গণনাট্য আন্দোলনে আর একটি শম্ভু মিত্রের বহুরূপীর অসামান্য সাফল্য ঘিরে নবনাট্যের জোয়ারে। দুটোর কোনওটা সম্পর্কেই যদিওতাঁর স্পষ্ট স্বচ্ছ প্রতিত্রিয়া ছিল না। তাঁর মতো বিরলপ্রতিভাশালী নাট্যব্যক্তিত্ব, একদা যাঁর 'সীতা' প্রযোজনার সূত্রে বাংলা নাট্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত, যিনি তৎকালে দশজন শ্রেষ্ঠ বঙ্গসন্তানের মধ্যে একজন বলে পরিজ্ঞাত, তাঁর জটিলতাও কম আশ্চর্যের নয়। পঞ্চাশের দশকে শ্রীরঙ্গমের ভেতরটা বড় অন্ধকার। পুরনো জীর্ণ দৃশ্যপট ডাঁই করা। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দড়ি টানলে কাঁচকোঁচ আওয়াজ। সামনের পর্দাটা ফাটাফুটো, যবনিকা চার খণ্ড হয়ে দোলে। প্রেক্ষাগৃহের চেয়ারে সাবধানে বসতে হয়। দেওয়ালে চুনবালি ঝরছে, প্রাঙ্গণের আগাছা আর বুনো লতা ধেয়ে আসছে, যে কোনওদিন গ্রাস করে নেবে রঙ্গশালা।

আরও কয়েকটি স্বাধীনতা দিবসে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছেন ভাদুড়িমশাই তবে আর কখনও মাউন্টব্যাটেনকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেননি তিনি, করতেও হয়নি। পরিবর্তিত রাজনৈতিক দৃশ্যপটে অচিরেই সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে দেশের 'প্রাণহীনআত্মতুষ্টিপরায়ণ' নেতৃবৃন্দ, অক্ষম অমনোযোগী শাসককুল। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থানের সঙ্কটমোচনে যারা ব্যর্থ, দেশের নাট্যশালা ও নাট্যসংস্কৃতির উদ্বর্তনে তারা যে কিছুই করবে না, করতে পারবে না, বুঝে গেছেন ভাদুড়িমশাই। ১৯২১-এ তাঁর নাট্যজীবনের আরম্ভ থেকেই একটি স্বনিয়ন্ত্রিত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের স্বপ্নে ছিলেন শিশিরকুমার। মঞ্চ হাতে পেতে, হাতে রাখতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি তাঁকে সারা জীবন। দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়েছেন, থিয়েটার ভূমি থেকে ছিন্নমূল হয়ে ঘুরতে হয়েছে বারবার ভারতের এই সর্বাগ্রগণ্য নাট্যপ্রযোজককে। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় আর্থিক অনিশ্চয়তায় ধুঁকছিল। আশা ছিল, দেশ স্বাধীন হলে, স্বরাজ রক্ষা করবে বাঙালির দেড়শো বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যস াধনা। বাংলা নাট্যের ইতিহাসে এটা সব কালেই দেখা গেছে--- নাটকের মানুষ শিল্পভাবনার সঙ্গে সমভাবে বিলোড়িত হয়েছেন থিয়েটার হাউসের ভাবনায়। মঞ্চের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে ভাল থিয়েটার সম্ভব নয়। সাহিত্য শিল্পের আর কোনও শাখায় জায়গা নিয়ে সৃজকের এই বাড়তি উদ্বেগটুকু থাকে না। আপন শয়নকক্ষের নির্জনতায় সা হিত্যসাধনা-সঙ্গীতসাধনা চলে, সমুদ্রতীরের হাত দু-চার জায়গাই ছবি আঁকার জন্য যথেষ্ট। থিয়েটারে তা হওয়ার নয়। অনেক মানুষের মিলিত কাজ থিয়েটার এবং কাজটা অনেক মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ। ঈশ্বর জগৎ গড়ে হাত ধুয়ে বসলেন জগৎ তারপর নিজের মতো চরে খাচ্ছে---সৃষ্টিতত্ত্বের এই বিশেষ মতটি সঙ্গীত চিত্রকলা ভাস্কর্যকাব্যকাহিনীর সঙ্গে বেশ মানানসই। থিয়েটারের সঙ্গে আদপেই নয়। বরং সেইমতটাই খাটে ---সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে স্রষ্ট্রা -স্রষ্টা আর সৃষ্টি একীভূত। নিজেদের মঞ্চ থাকা চাই। গিরিশচন্দ্র শতাধিক নাটক লিখে যতকৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার চেয়ে কম বাহাদুরি দেখ াননি রঙ্গশালা নিজের দখলে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে। দেশ যখন পরাধীন ছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আশ্বাসও পেয়েছিলেন ভ াদুড়িমশাই --- স্বাধীনতা লাভের পরে স্থায়ীভাবে একটি মঞ্চ হাতে পাবেন, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন---অর্থকরী উদ্বেগ নিয়ে তাঁকে নিঃশেষ হতে হবে না। কালক্রমে স্থায়ী রঙ্গশালার ভাবনা ভাদুড়িমশায়ের চেতনায় রূপ নিয়েছে জাতীয় নাট্যশালার। নাটক ও অভিনয়ের মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে নতুন করে গড়া -- জাতির বিচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা কর্মশক্তি এবং ভ াবপ্রেরণাকে একটি জাতীয় কেন্দ্রে সংহত করা, দেশের বিচিত্র নাট্যরীতি নাট্য উপাদান এবং নাট্যভাষাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জাতির আত্মপ্রকাশের সিংহদ্বার খুলে দেওয়ার বাসনা ভাদুড়িমশায়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক তীব্র প্রতির াগ। ভাবতেন, তিনিই হবেন সে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। এমন কথা বলা যাবে না, শিশিরকুমারের প্রতিভার মতো তাঁর আক াঙ্ক্ষাও ছিল অপরিমিত। দেশের মুক্তিসংগ্রামে নাটক ও নাট্যশালার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করে, তাকে সর্বো চচ সম্মান জানানো সরকারের অবশ্যকর্তব্য---বলতেন শিশিরকুমার।

১৯৫৩-য় দিল্লিতে স্থাপিত হয় 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমি'। দেশের নৃত্য - নাটক - সঙ্গীতশিল্পের সম্যক বিকাশ ও বিবর্ধনের উদ্দেশ্যে গড়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শিশিরকুমারের কোনও জায়গা হয়নি। ততদিনে দিল্লিতে বহুসংখ্যক চৌকস ন াট্যবোদ্ধা এবং ম্যানেজারের ভিড়। শুধু শিশিরকুমার কেন, হাতে গোনা দু-চারটি নাট্যদল ও তাদের কর্ণধাররা ছাড়া ব াংলা বিরাট সংখ্যক নাট্যকর্মীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি আকাদেমির দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছনোর। অধিকাংশের কাছে সঙ্গীত ন াটক আকাদেমির কর্মকাণ্ডও ছিল অজানা। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি নাট্যপ্রযোজনার জন্যে অর্থসাহায্য করে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওই গুটিকয় দলই কেবল তা পেয়ে এসেছে, এবং তাও কাকপক্ষীর অজ্ঞাতসারে অথচ স্বাধীনতা - উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে নাট্যচর্চার ব্যাপকতা অবিশ্বাস্য। নাট্যদল ও নাট্যকর্মীর সংখ্যা বিচারে অবশিষ্ট ভারত হার মানবে পশ্চিমবঙ্গের কাছে। দেশ ও কালের প্রতি দায়বদ্ধ এই অব্যবসায়িক থিয়েটারের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামও নিরবচ্ছিন্ন। তাদের কাছে কক্ষনোও পৌঁছয়নি আকাদেমির ত্রাণ তহবিল। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রতি বছর দেশের কৃতী শিল্পীদের অ্যাওয়ার্ড দিয়ে আসছে প্রায় জন্মকাল থেকে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, কি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়ের মত মঞ্চশিল্পীদের ভাগ্যে কেন যে শিকে ছিঁড়ল না, বলা যাবে না। জাতীয় প্রতিষ্ঠানে কেন যে অপেশদার শিল্পীদের অগ্রাধিকার থাকবে, তারও কোনও সমুচিত জবাব নেই। এ ব্যাপারে সঙ্গীত নাটক আকাদেমিতে রাজ্যের প্রতিনিধিদেরর ভূমিকাও বড় অদ্ভুত। নিন্দুকেরা বলে, নিজেদের জন্যে ছাড়া আর কারও জন্যেই তঁ ারা দিল্লিতে মুখ খুলতেন না। সত্তর দশকের শেষ থেকে অবশ্য অবস্থা বদলাতে থাকে। সঙ্গীত নাটক আকাদেমির প্রতিষ্ঠাক

ালে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় শিশিরকুমারকে ফেলোশিপ দান করেছিলেন। শিশিরকুমার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নৃত্যনাট্য সঙ্গীত আকাদেমির প্রতিষ্ঠাকালে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় শিশিরকুমরকে তার ডিন - এর পদ গ্রহণে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভাদুড়িমশাই তাতেওসম্মত হননি। সরকারি সংস্থায় কর্মকরা মানে সরকারের মহিমা কীর্তনের দায় বহন করা--- মনে হয়েছিল তাঁর -- থিয়েটার করা কারও দাসত্ব করার জন্যে নয়। জাতীয় নাট্যশাল ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে আর একবার প্রমাণ করার সাধ ও স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছিল---ভাঙা স্বপ্নের টুকরোগুলো জিভের তলায় রেখে ভাদুড়িমশাই ক্রমাগত বিষোদগার করতেন, আর্তনাদ করতেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ ধবস্ত নাট্যচার্য স্বেচ্ছানির্বাসনে। সিঁথির মোড়ের ছোট্ট বাড়িটায় তিনি বড় একা। শেষ ইচ্ছা, মৃত্যুর পরে যেন কোনও শোক মিছিল না হয় --- একগাছি ম ালার প্রত্যাশায় কোনও নাট্যশালার দ্বারে যেন না দাঁড়ায় তাঁর মহদেহ।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি কলকাতায় রবীন্দ্রসদন গড়ে উঠতে জাতীয় নাট্যশালার অপূর্ণ অবদমিত বাসনাটা আবার বেড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকর্মীদের চেতনায়। দ্বারোদঘাটনের দিন বিশাল সমাবেশ সদনের সামনে। নাট্যকার মন্মথ রায় শিশিরকুমারের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছিলেন, রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাট্যশালারূপে ঘোষণা করা হোক-- সরকারি আওত ার বাইরে তাকে স্বশাসিত রাখাহোক। কোনওটাই হল না অদ্যাবধি।

জাতীয় নাট্যশালা নয়, শম্ভু মিত্র চেয়েছিলেন একটি থিয়েটার আর্ট কমপ্লেক্স--- যেখানে নাট্যচর্চার পাশাপাশি থাকবে সঙ্গ ীত নৃত্য এবং চিত্রকলাচর্চার ব্যবস্থা। '৬৮তে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি। শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে কলকাতার চ ারটি বিশিষ্ট নাট্যদল---বহুরূপী, নান্দীকার, রূপকার ও পদাতিকের এই প্রয়াসে উদযুক্ত হয়েছিলেন কলকাতার বহু ন াট্যপ্রেমী মানুষ এবং উদয়শঙ্কর রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ রায়, বিষ্ণু দে-র মতো শিল্পী - কবিরাও। নাটমঞ্চ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র 'একলা একটা মঞ্চ সংগ্রহ করে ফেলা আমাদের মধ্যে কিছু লোকের পক্ষে খুব একটা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁরা চেয়েছেন বুদ্ধি চালিত চিসম্মত নাট্যমঞ্চ সৃষ্টি হোক দেশে, সেটা যেমন ব্যবসাদার হবে না, তেমনই কোনও রাজনৈতিক দলের ভেঁপুদার হবে না। তেমনই আবার জীবনবিমুখ বিশুদ্ধ শিল্পের ভড়ংকরবে না। সেটা সকল অর্থে সামাজিক হবে। গভীরভাবে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন।' নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় দু মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। চার দলের যৌথ অভিনয়ে এবং উৎসাহী মানুষের চাঁদায়। চার বছরে চারটি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় দশচক্র ও রক্তকরবী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মুদ্রারাক্ষস আর পদাতিকের শ্যামানন্দ জালান করিয়েছিলেন গিরিশ কারনাডের তুঘলক। অর্থ আহৃত হয়েছিল সাড়ে তিন লক্ষের মতো। সব কিছু হওয়ার পরে এক খণ্ড জমি হল না এই মহানগরে। র াজ্যের কংগ্রেসি আমলেও মিলল না, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে দরবার করেও না, বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ন া। আশির দশকের গোড়ায় নাটমঞ্চের পরিকল্পনাটই পরিত্যক্ত হয়। সংগৃহীত চাঁদা সুদসমেত ফিরিয়ে দেওয়া হয় দাত াদের হাতে। অভিনয় থেকে লব্ধ অর্থ দান করা হয় চক্ষুচিকিৎসাকেন্দ্র আর ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে।

এবার শু হল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর প্রতিষ্ঠিত নাট্যঅ াকাদেমির পরিচালনায় সর্বদা রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের নিয়ে গড়া উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শ নেওয়া হয়। অনস্বীক ার্য, বাংলা নাট্যের বিকাশে, উন্নয়নে, প্রসারে নাট্য আকাদেমির ভূমিকা অসাধারণ। সংরক্ষণ ও প্রকাশনা, পুরস্কার ও অনুদানপ্রদান, নাট্য প্রযোজনা, নাট্য গবেষণা, সর্বভারতীয় নাট্যোৎসবের আয়োজন, নাট্য প্রশিক্ষণ, জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌য াপন ইত্যাদি নানাবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে পশিচমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি গত দশ বছরে যা করেছে, সারা ভারতে কুত্রাপি তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নেই। '৯৫ সালে ৮৫ জগদীশচন্দ্র বসু রোডে বহু আকাঙ্ক্ষিত বঙ্গ নাট্যভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সব শেষে গত বছরই সরকার প্রস্তাব দিলেন,আর নয় -- আর সরকারি কর্তৃত্বে নয়, এবার ন াট্য আকাদেমি স্বশাসিত হোক। কেবল পরামর্শদাতা সেজে নয়, নাটকের মানুষেরাই চালান নাট্য আকাদেমি, শহরের সরকারি মঞ্চগুলির পরিচালনায় ভার নিন, দায়িত্ব নিন বঙ্গ নাট্য ভবনের। সরকারি লাল ফিতের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে স্ব তঃস্ফূর্ত হয়ে উঠুক পশ্চিমবঙ্গের নাট্যসংস্কৃতি। সরকারের প্রস্তাবটি এল উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায়। এবার এক আশর্চ্য কাণ্ড। সভায় একযোগে ধবনি উঠল, 'আমরা স্বশাসন চাই না। সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাই। এই তো বেশ চলছে, দিব্য চলছে।'

সাতচল্লিশ থেকে সাতানববই --- স্বনিয়ন্ত্রিত মঞ্চের জন্য আন্দোলন। দীর্ঘ কাহিনীর শেষটা---পরিণতির চমকটা বুঝি মপ

াসাঁর ছোটগল্পকেও হার মানায়। এর পর যদি দুর্মুখ সামালোচকরা বলেন, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাটকের মানুষদের আত্মবিশ্বাস এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে, স্বাধিকার স্বশাসন মুক্ত নাট্যচর্চা ইত্যাদির সুযোগ দুধ আর মধুর সঙ্গে বেটে মুখে ঢেলে দিলেও ওরা উগরে ফেলবে---এবং যথারীতি সরকারের কণ্ঠলগ্ন হয়েই থাকবে, কী জবাব দেব আমরা? শিশিরকুমার ভাদুড়ি, শম্ভু মিত্র আজ নেই, তাঁদের অহঙ্কারের উত্তরাধিকারটুকুও হারিয়েছি আমরা।

।। দুই ।।

আমাদের সাহিত্যে গণচেতনার হাওয়া বইতে শু করে এই শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই। মুক্তধারা, রথের রশি, রক্তকরবী---বিশের দশকে পর পর লেখা তিনখানি রবীন্দ্রনাটকের মূল নির্ভর সমাজের নিচুতলার মানুষ -- যুগে যুগে বঞ্চিত অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষ। কালিকলম ও লেখকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক গণচিত্রণে সাহিত্যের লক্ষ্যমুখ বদলের পরিকল্পিত প্রয়াস। ১৯৩৬-এ স্থাপিত প্রগতি লেখক সঙেঘর ইস্তাহারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব 'আমাদের বিপর্যস্ত সমাজের দাবি মেনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা চাই জনসাধারণের সঙ্গে সর্বাধিক কলার নিবিড় সংযোগ।'

সাহিত্যের এই দিকবদলের হাঁক যে তৎক্ষণাৎ আমাদের থিয়েটারে ঢুকে পড়েছিল এমন নয়। যেখানে যথাপূর্ব চলছিল বহমান জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন। প্রত্যক্ষ ও জাগতিক সত্যকে উপেক্ষা করে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের মহিমাকীর্তন। ধনী, উচচবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মনোরঞ্জনে তৎসম জীবনের চিত্রমালা প্রদর্শন। এমনিতেই একটা ধারণা খুব ঘোরফেরা করে, সাহিত্যে যা আজকেঘটেছে শিল্পকলায় সেটা ঘটবে আগামীকাল। বলেন অনেকে, পরিবর্তনের চিন্তাটা আগে আসে সাহিত্যিকের মস্তিষ্কে, শিল্পে ঘটে তার অনুবর্তন। এসব কথা প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মতোই পুরাতন। আজ আর এসবের কোনও উপযুক্ততা নেই। চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে কম নান্দনিক মূল্যামানের বদল ঘটেনি পৃথিবীতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে চলচিচত্র যত স্বতন্ত্র শিল্পসত্তা, স্বকীয়তা অর্জন করেছে, তত সে এত অভাবিত কোণ থেকে জগদ্দল সমাজকে আক্রমণ ও বিব্রত করেছে--- যা আর কেউ করেনি, ভাবেনি। তবে আমাদের বাংলা নাট্যের পালাবদল যে চল্লিশের দশকের আগে ঘটল না, তার বড় কারণটা এইরকম -- চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার বলতে ব্যবসায়িক রঙ্গালয়ের নাট্যসৃষ্টিকেই বোঝাত--- সেটাই ছিল মূল স্রোত -- আর কে না বোঝেন, বাণিজ্যেক্ষেত্রে দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটে না। লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে প্রগতিচিন্তার ঝুঁকি নেবে না বাণিজ্যিক থিয়েটার -- প্রগতিচিন্তার উঁকিঝুঁকিও বরদাস্ত করবে না -- যেমনকরে না বাণিজ্যিক সিনেমা। পরীক্ষিত ফর্মুলা নিয়ে চলবে তারা, পকেট কাটা গেলে বলবে, চেনা পকেটমার কেটেছে --- তবু যা রক্ষে। ব্যবসায়িক থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে দিকপরিবর্তন অসম্ভব ছিল, দরকার ছিল অন্য থিয়েটারের উত্থানের। ১৯৪৩-এ ভারতীয় কম্যুনিস্টপার্টির সাংস্কৃতিক শাখা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা সেদিক দিয়ে ঐতিহাসিক গুত্বের অধিকারী। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথী' এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' প্রযোজনার মধ্যে গিয়ে গণনাট্য সংঘ বুঝিয়ে দিল, এটা কোনও বিচ্ছিন্ন বিস্ফোরণ নয়, একটি সুবৃহৎ আন্দোলনের সূচনা। যুদ্ধ মন্বন্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হতাশ দ্বাস দেশবাসীকে ব্যবসায়িক থিয়েটারের বাঁধা ঢঙে ভুলিয়ে রাখার বাস্তবের মুখোমুখি। আত্মগ্লানির সুযোগ পেল মানুষ। যেমন একদা জুটেছিল দীনবন্ধুর নীলদর্পণে। দেশের বহু নাট্যকার অভিনেতা নৃত্যশিল্পী সঙ্গীতশিল্পী কবি সাহিত্যিক চলচিচত্রকারের যোগদানে দেশব্যাপী প্রগতিপন্থী সাংস্কৃতিক চেতনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল গণনাট্য সংঘ। থিয়েটার আর পেশায় নয়, থিয়েটার সামাজিক দায়বদ্ধতায়। থিয়েটার আর ব্যক্তিগত মালিকানায় নয়, থিয়েটার যূথবদ্ধ শিল্পীর সমবেত প্রয়াসে। থিয়েটার আর পুরাতন সমাজের উচ্ছিদ্যমান রীতিনীতির পৃষ্ঠপোষণে নয়, থিয়েটার তাদের সমূল উচ্ছিত্তিতে। সমাজচেতনা আদর্শবোধ জীবনদর্শন বিনা যে সংস্কৃতিসাধনা অনর্থক, এ বিশ্বাস বাংলা থিয়েটারে নিয়ে এসেছে গণনাট্য সংঘ। শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য পরিচালিত নবান্নের নতুন বিষয়বস্তু, নতুন অভিনয়ধারা, নতুন আঙ্গিক, আগামী দিনের নতুন বাংলা থিয়েটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল।

বছর দশেকের বেশি গণনাট্য সংঘের ঝড়টা স্থায়ী হয়নি। ভারত স্বাধীন হতে গণনাট্য সংঘে ভাঙন শু হয়।' ৪৮-এ কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হতে, সংঘের সক্রিয়তা স্তিমিত হয়ে আসে। অনেকেই গণনাট্য ছেড়ে এসে যে যাঁর নিজের মতো করে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করলেন। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য' ৪৮-এ গড়লেন বহুরূপী। পরবর্তীকালে নবান্নের আরও দুই স্তম্ভ-- বিজন ভট্টাচার্য, চাপ্রকাশ ঘোষও ওই পথে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে উৎপল দত্ত যোগ দিয়েছেন গণনাট্য

সংঘে, বহিষ্কৃতও হয়েছেন। ১৯৫৩-য় উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপ ইংরেজি নাটক করা বন্ধ করে পূর্ণোদ্যমে বাংলা নাটকের অভিনয় শু করে। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের লেখাপত্র থেকে অনুমান, দুজনের কেউই গণনাট্য সংঘের নাটক ও ন াটক করার আনুষঙ্গিক প্রকরণশৈলীতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। শম্ভু মিত্রের কথায়, 'থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করতে গেলে চাই এমন কিছু ধ্রুপদী নাটক যা যুগে যুগে নতুন ভাষ্যে উপস্থাপিত করা যাবে। নাটক তো কারখানায় ফরমাস দিয়ে তৈরি কর ানো যায় না।' গণনাট্য আন্দোলনের নাটকের সমস্যা নিয়ে লিখেছেন উৎপলদত্ত 'কেন এমন হয় যে তুচ্ছ সমস্যা নিয়ে অ ামরা ভীষণ মাথা ঘামাতে থাকি অথচ দেশের বৃহত্তর সমস্যাগুলি আমাদের নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? ...ধর্মের অনুশাসনের নির্বুদ্ধিতাকে উদঘাটিত করা রবীন্দ্রনাথের ''বিসর্জন'' নাটক আমরা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ''তপতী'' বা ''তাসের দেশ'' আমরা করতে পারি। অথচ আমাদের নাট্যকারদের কখনও এই দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয় না।' শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত দু'জনেই চেয়েছেন স্থায়ী গুণের সুগঠিত নাটক, চেয়েছেন সর্ব আঙ্গিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ যোজনায় সুঠাম সুন্দর নাট্য উপস্থাপনা। বিষয়ের সঙ্গে রূপরচনার দিকটাকে সমান গুত্ব দিয়েছেন দুজনে। তফাত বোধহয় এইখানে যে, একজন চেয়েছেন বাইরের জগৎটার অনুপুঙ্খ অনুকৃতি, আর একজন চেয়েছেন বাইরের জগৎ অন্তর্জগতে যে বিলোড়ন সৃষ্টি করে তার উন্মোচন। উৎপল দত্ত সরাসরি রাজনৈতিক থিয়েটারের পক্ষপাতী, শম্ভু মিত্র তা নন। অনুকৃতিবাদী আর প্রকাশবাদীর মধ্যে দূরত্ব যতটুকু বা যতখানি, উৎপল দত্ত শম্ভু মিত্রের মধ্যে দূরত্ব ততটুকু বা ততখানি।

বহুরূপী স্থাপনে শম্ভু মিত্রের আকাঙক্ষা একটি ছত্রে পরিষ্কার 'ভালো নাটক ভালোভাবে করব।' সোজা সরল এই ব াক্যটির মধ্যে কী যে স-জনসাধ লুকিয়েছিল, যার টানের অসংখ্য নাটকের দল গড়ে উঠতে থাকল এরপর - শহরে গ্র ামেগঞ্জে সর্বত্র - কোথাওগণনাট্য সংঘের কোনও প্রান্তনীকে ঘিরে, কোথাও আনকোরাদের নিয়ে। বোকারা ঠাট্টা করত, ব্য াঙের ছাতায় ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। দল যত, নাটক তত নেই। স্বভাবিক কারণে এই সময়টায় স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক -- একাঙ্ক নাটক রচনার ঢেউ ওঠে। একাঙ্ক নাটকের বিস্তারেবাংলা নাট্যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। বাতাসে উড়ছিল নবানাট্য আন্দোলন। পঞ্চাশের দশক জুড়ে বাংলা থিয়েটারে নাটকের জোয়ার। স্বাধীনতা যতই বিপর্যয় ডেকে আনুক বাঙালী জীবনে, তার সৃজনশীলতা স্তব্ধ হয়নি। বরং নব নব আবিষ্কারে মেতেছে তার কল্পনা। সাহিত্যে চলচ্চিত্রে সঙ্গীতে চিত্রকলায় অজস্র প্রমাণ। ভারি আশ্চর্যের, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা পরিবারের ছেলেরাই বেশি সংখ্যায় এসব কাজে ঝাঁপিয়েছে। হয়তো জীবনের ক্লেদগ্লানি থেকে মুক্ত হবার একটা তাড়না তারা অনুভব করেছিল--- এই আধাচেনা ভূখণ্ডে নিজেদের প্রমাণ করার তাগিদ যাকে বলে।

ষাটের দশকের শুতেই এল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান্দীকার। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় -- এই ত্রয়ীর সৃজনসম্ভারেস্বাধীনতার পরের পঁচিশ বছরে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা নাট্যের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়টি। বহুরূপীর চ ার অধ্যায়, দশচক্র, রক্তকরবী, ডাকঘর, পুতুলখেলা, রাজা অয়দিপাউস, রাজা--- উৎপল দত্তের থিয়েটার গ্রুপ ও পি. এল. টি.-র নিচের মহল, অঙ্গার, কল্লোল, মানুষের অধিকারে, তিতাস একটি নদীর নাম, টিনের তলোয়ার, ব্যারিকেড, দুঃস্বপ্নের নগরী -- নান্দীকারের নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, যখন একা, শের আফগান, ভালো ম ানুষ, তিন পয়সার পালা--- এবং এর সঙ্গে যদি যোগ করা হয় ক্যালকাটা থিয়েটার, রূপকার, অনুশীলন সম্প্রদায়, মুখো াশ, থিয়েটার সেন্টার, থিয়েটার ইউনিট, শৌভনিক, চতুর্মুখ, গন্ধর্ব, সুন্দরম, নক্ষত্র, চলাচল, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, থিয়েট ার কমিউন, গান্ধার কোমলগান্ধার, চেতনা, সায়ক এবং আরও আরও দলের নাট্যকৃতি -- বিগত পঞ্চাশ বছরের প্রথম ার্ধের নাট্যঐর্যের পরিমাপ তখন আর গোনাগাঁথা শব্দের প্রবন্ধে কুলোবে না। বহুরূপীর 'রক্তকরবী'শম্ভু মিত্রের এবং গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা থিয়েটারের সর্বোত্তম প্রযোজনা। এবং সম্ভবত দেশ - বিদেশ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাটকের শ্রেষ্ঠমঞ্চায়ন। শম্ভু মিত্র ছাড়াও আরও কয়েকজন প্রকৃত গুণী শিল্পীর যোগাযোগ ঘটেছিল রক্তকরবীতে -- অভিনয়ে তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু,অমর গাঙ্গুলি, শোভেন মজুমদার, কুমার রায়, ----দৃশ্যসজ্জা - আবহে খালেদ চৌধুরী, আলোকসম্পাতে তাপস সেন। খালেদ চৌধুরীএবং তাপস সেন দুই বিস্ময়কর প্রতিভা। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা নাট্যে এঁদের অসীম অবদান। অ াজও সমান সৃজনশীল। উৎপল দত্তের প্রয়োজনাতেও অংশ নিয়েছেন তাপস সেন। অঙ্গারের আলোক - পরিকল্পনা তো ষ াটের দশকে বিতর্কের হইচই সৃষ্টি করেছিল --- নাটক বড়, না তার আঙ্গিক বড়? সুরেশ দত্ত, নির্মল গুহরায়কে দৃশ্য পরিকল্পকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। শোভা সেন, রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়,

নীলিমা দাসদের নিয়ে সে সময় তাঁর শিল্পীগোষ্ঠীও ছিল দাণ শক্তিশালী। অজিতেশের সঙ্গে ছিলেন একদল তরতাজা তণ - তণী - অজয় গাঙ্গুলি, দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চিন্ময় রায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চত্রবর্তী, মায়া ঘোষ, নিমাই ঘোষ, বিভ াস চত্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায় -- থিয়েটারে যাঁদের অসম্ভব প্যাশন। সে সময় ক্যালকাটা থিয়েটারে বিজন ভট্টাচার্যের গোত্রান্তর, মরাচাঁদ, দেবীগর্জন, গর্ভবতী জননী-- চতুর্মুখে অসীম চত্রবর্তীর জনৈকের মৃত্যু, রূপকারের সবিতাব্রতদত্তের পরিচালনায় ব্যাপিকা বিদায়, নক্ষত্রে শ্যামল ঘোষের পরিচালনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ, চন্দ্রলোকে অগ্নিক াণ্ড, থিয়েটার ইউনিটে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি --- পঞ্চাশ - ষাটের দশকের বাংলা থিয়েটারের বৈচিত্র দেখবার মতো। শ্যামল ঘোষ এবং তণ রায় ছাড়া আর কেউ রহস্যনাটক লেখা বা প্রযোজনার কথা ভাবেননি, সাহস করে এগিয়েও যাননি। তণ রায় যথেষ্ট প্রগতিপন্থী নন, মাঝেমধ্যে তণ রায়দের বিদ্ধে অভিযোগও উঠেছে দেশকাল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দেননি তিনি। অভিযোগের সারবত্তা থাকত যদি তণ রায় দেশকালমানুষের বিদ্ধে দাঁড়াতেন। নইলে সবাইকে যে একই ধানক্ষেত্রে লাঙল চলাতে হবে, এমন,এমন তো কথা নয়। তাতে ধানক্ষেতেরই সর্বনাশের সম্ভাবন া থাকে। বেয়ারা লাঙল চালানোর দৃষ্টান্ত তো আছেও ভূরিভূরি। সব দেশের থিয়েটারেই নানা ধরনের কাজ হয়। নানা রকম আছে বলেই সাহিত্যপাঠ এত সুখের, শিল্পে নানা রকম সম্ভব বলেই তত্ত্বশাস্ত্র থেকে সে নিজের দূরত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। ব্যতিত্রমী কাজে খুব উৎসাহ ছিল শ্যামল ঘোষের। নক্ষত্রে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে ধরবার আগে, গন্ধর্বকে দিয়ে কাব্যনাটক করিয়েছিলেন তিনি। নীরেন্দ্রনাথ চত্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, দিলীপ রায়রা সে সময় উৎকৃষ্ট কিছু কাব্যনাটক রচনা করেছিলেন - মঞ্চস্থ করার সম্ভাবনা ছিল বলেই লিখেছিলেন। এমন মঞ্চের দিক দিয়ে কোনও আগ্রহ নেই, ফলে ক াব্যনাট্যের ধারাটি নিদ্দিষ্ট। তখন সাহিত্যিকদের সঙ্গে মঞ্চের একটা সখ্য গড়ে উঠেছিল। বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তো অনেকে আগে থেকেই নাটক লিখতেন, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু শেষে মঞ্চের জন্যে কলম ধরেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণী, প্রথম পার্থ, অনাম্নী অঙ্গনা, পাতা ঝরে যায় নাটকগুলি রীতিমতো জনপ্রিয় হয়েছিল মঞ্চে। গন্ধর্ব পত্রিকার সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহার চাপে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও নাটক লিখতে শু করেছিলেন। বোধহয় অর্ধেকটা লিখেও ফেলেছিলেন -- ভাবা যায়! কী দাণ উত্তেজনা ছিল বাংলার নবনাট্য ঘিরে, স্বাধীনতার পরের পঁচিশ বছর জুড়ে।

বাংলায় ভালো নাটক নেই ভালো নাটক লেখা হয় না---এ আক্ষেপ আজকের নয়, উঠেছে স্বাধীনতার পরের দিন থেকে। ভালো নাটক লিখব বললেই লেখা হয় না, আড়ালে থাকে বহুবিধ সামাজিক কারণ। দায়ী থাকে থিয়েটারের অবস্থাও। স াতচল্লিশের পর থিয়েটারের অবস্থাও। সাতচল্লিশের পর থিয়েটার দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। শচীন সেনগুপ্ত মন্মথ রায় বিধায়ক ভট্টাচার্য তুলসী লাহিড়ী দিগিন্দ্রচন্দ্র নাট্যপরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের বদলে নেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে, সময় সুযে াগও ছিল না কারও কারও পক্ষে। মন্মথ রায় শেষ, দিকে একাঙ্কই লিখেছেন বেশি। সেগুলো আবার এতই হ্রস্ব আর সূক্ষ্ম, মঞ্চের চেয়ে হয়তো বেতার বা দূরদর্শনেই মানাবে ভালো। সলিল সেন, কিরণ মৈত্র, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বী মুখোপাধ্য ায় প্রমুখের নাটকের বিষয় এবং গঠন বড় পরিচিত। বরং নাটকের গঠন অভিনবত্ব ছিল অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের। শম্ভুমিত্র ন াটক লেখায় খুব উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না। নইলে প্রথমে উলুখাগড়া এবং পরে চাঁদবণিকের পালার মতো মৌলিক নাটকখানি লিখেছিলেন, তাঁকে কেন অত অনুবাদ বা বঙ্গীক রণ করতে হল? বাংলার নতুন থিয়েটারের বিপুল অ াস্য পরিতৃপ্ত করতে দরকার ছিল এক ঝাঁক নতুন নাট্যকারের। ত ঝাঁকে ঝাঁকে এত ভালো নাট্যকার কোন্ দেশেইবা জন্ম ায় এককালে? দুই তিন চার বড়জোর। মস্কো আর্ট থিয়েটারে গর্কি আর চেকভকে বাদ দিলে কন্স্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কিকে বেশিসময়টা নির্ভর করতে হয়েছে বিদেশি নাটকের অনুবাদের ওপর। অজিতেশ বলতেন, 'বাংলায় নাটকের অভাব নেই, অভাব নাট্যকারের।যে নাটক আমায় ক্ষেপায় না, তা আমি করতে যাব কোন দুঃখে? আপনাদের নাটক করতে গেলে গে াড়াতেই আমি পঞ্চাশ নম্বর আগামঘরে তুলব---তা হলে আমি কার নাটক করব বলুন?''বিদেশি নাটকের প্রাদুর্ভাব আম াদের মৌলিক সৃজনের পথ দ্ধ করছে'---- এ সব চিৎকারের সঙ্গে অভিযুক্ত করা হত প্রধানত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'আসুক নাইবসেন, চেকভ, মিলার, ওনীল, ব্রেশট, পিন্টার, কিংবা মে াহন রাকেশ, বিজয় তেন্ডুলকার, আমরা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই টিকে থাকতে এসেছি। বাংলার দর্শক বুঝে নিক ভালো ভালো দেখতে শুনতে কি রকম -- লম্বা না ফর্সা, বেঁটে না কালো। নইলে আমরা যখন একআধটা লিখে ফেলব, তখন

বুঝতেই পারবে না সেটা কালো না ধলো।' ---ষাটের দশকের মাঝামাঝি বলেছিলেন তণ মোহিত, একটাআলোচনাসভায়। হুবহু যে এই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছিলেন, এমন দাবি করি না --- তবে তেজটা আরও চাঁচাছোলা ছিল অবশ্যই। উৎপল দত্তের মনে হয়েছিল, কারও জন্যে অপেক্ষা না করে নিজের ত্রাণে নিজেই কলমধরা ভালো। আমাদের কালে উৎপল দত্তের মতো এত নাটক আর কেউ লেখেননি। নাটক, যাত্রাপালা, পথনাটক ---সব মিলিয়ে অজস্র বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝা। ইতিহাস পুরাণ দেশ বিদেশ -- সর্বত্র উৎপল দত্তের সমান দাপট এবং স্বাচ্ছন্দ্য। প্লট গঠনে উৎপল দত্ত সর্বদা নিপুণ। মুগ্ধ হয়েছি তাঁর মানুষের অধিকারে আর টিনের তলোয়ারে। লোহার ভীম বা নীলকণ্ঠের মতো একাঙ্ক কখানাই বা লেখা হয়েছে বাংলায়? পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এলেন বাদল সরকার, আর ষাটের দশকের গোড়ায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এই দুজনকে না পেলে, সত্যি বলেত কি, বাংলার নবনাট্যেরমান রক্ষাই হত না। বাদল সরকার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় বাঙালি নাট্যকার। এবং ইন্দ্রজিৎ, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, বাংলা থিয়েটারে নাটক লেখার মোড় ঘুরিয়েছে। বল্লভপুরের রূপকথা, রাম শ্যাম যদু, কবিকাহিনীর মতো অভিজাত বুদ্ধিশীল কৌতুকনাটক বাদল সরকারের আগে কেউ লেখেননি। বাদল সরকার অবশ্য দীর্ঘদিন মঞ্চের জন্য লিখলেন না। থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের পুরোধা বাদল সরকার এখন লিখছেন থার্ড থিয়েটারের জন্যেই -- মিছিল, ভোমা, সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস, হট্টমালার দেশে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের নাটকগুলি স্বাদে গন্ধে এতই আলাদা, তাদের যে কোন্ গোত্রে রাখা হবে সমঝে উঠতে না পেরে 'মৃত্যুসংবাদ,' 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'ক্যাপ্টেন হুররা'র নির্দেশক শ্যামল ঘোষ নাম রেখেছিলেন কিমিতিবাদী। একটা ভাঙাচুরো অসম্পূর্ণ অগোছালো মানুষ আলটপকা ঢুকে পড়েছে এক অচেনা বাসায়, সম্পূর্ণতা খুঁজে ফিরছে, কাতুতিমিনতি করছে --- প্রথম দিকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক পড়লে বা দেখলে বিশ্বাস হয়, লেখাটা তাঁর জীবনদর্শন থেকে উৎসারিত। যেটা সবার ক্ষেত্রে হয় না।

গণনাট্য থেকে নবনাট্য। দুয়ের মধ্যে অনেকেই দেখতে পেয়েছেন দুই বিরোধী শিবিরের দ্বন্দ্বসংঘাত। ইতিহাস জানে এই বিভক্তিকরণ অনিবার্য ছিল কি না। তবে দুয়ের যোগফলে বাংলা থিয়েটার যে লাভবান হয়েছে, তাতে কোনও ভুল নেই। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা থিয়েটারের এমন শিল্পী কজন আছেন যিনি গণনাট্যের দর্শন, আদর্শ মেনে নেননি? গণনাট্য যদি হয় শেকড়, নবনাট্যে তারপল্লবিত বিকাশ। দুয়ের মিলে বাংলানাট্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা। যে কোনও একটির অভাবে বাংলা নাট্যের ধারভার কমত অনেকখানি। হয় সে অক্ষমের হাতে পড়ে হয়ে উঠত একঘেয়ে বক্তৃতা-সর্বস্ব নিরাভরণ ভীষণদর্শন শ্রুতিকটু সভাক্ষেত্র, নতুবা অতিক্ষমতাপন্নেরক্রীড়াচাতুরিতে চিকণ, প্রিয়দর্শী, ফুঁ দিলে উড়ে যায়, ঘাসের মাথায় শিশিরের মতো ক্ষণজীবী।

।। তিন ।।

আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চাশ বছরের দ্বিতীয়ার্ধ ম্লান, স্তিমিত। বলতে কি, বিষাদময়ও। এই অর্ধেই বেশি ভাঙচুর, অন্তর্ধান, মৃত্যু এবং নানা জটিলতা। শম্ভু মিত্র মঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। শেষ দেখেছি তাঁকে ক্যালকাটা রেপারটরির 'গ্যালিলেও'তে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়েছেন, যাত্রায় যোগ দিয়েছেন, ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে ঢুকেছেন। এই অর্ধে একটাই তাঁর বড় কাজ--- পাপপুণ্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি জমছিল উৎপল দত্তের শেষের দিকের প্রযোজনায়। পঞ্চাশ ষাটের দশকের দিকপালদের আর সেই চেহারায় দেখতে না পেয়ে দর্শকের হতাশা জমছিল। বাংলা নাটক নিয়ে ষাটের দশকে সে হইচইটা ছিল, প্রচার ছিল---তাও থেমে গেল। সে সময় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, অজিত ঘোষ, নৃপেন্দ্র সাহা, বিষ্ণু বসু, দর্শন চৌধুরীরা বাংলা থিয়েটারের ভালোমন্দ চ্যুতিবিচ্যুতি সব কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতেন, সুখ - দুঃখের সঙ্গে নিজেদের জড়াতেন, ইদানীং সম্পর্কটা যেন সৌজন্যমূলক। দেবাশিস দাশগুপ্তের অনু পস্থিতি টের পাচ্ছিলাম আমরা, এবার ধরণী ঘোষেরও পাওয়া যাবে। সংবাদপত্রের সম্পাদকরাই পঞ্চাশ - ষাটের দশকে থিয়েটারের মূল্যায়নে কলম ধরতেন -- বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মাঝেমধ্যে হলেও, নিয়মিত লিখতেন সন্তোষকুমার ঘোষ। আজকাল সাংবাদিকতায় সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তরা আসেন থিয়েটারের ওপর লেখালেখি করে হাত পাকাতে।

নাট্যদলগুলির সাবেকি সংগঠনিক ভিতটাও এতদিনে অনেক আলগা, নড়বড়ে। কে না জানেন কর্মীদের নিঃসর্ত এবং নিঃস্ব

ার্থ শ্রম ভালবাসার ওপর দাঁড়িয়ে বাংলার অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটার। পঞ্চাশ - ষাটে নবীন নাট্যকর্মীদের যে একাগ্রতা নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন ছিল, আজকের থিয়েটারে নবাগতদের মধ্যে তা মেলে কি? সময় নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়ী তার জন্যে। কী যে পাগলামি ছিল সেই সময়টায়! অনেক বন্ধুকে দেখেছি নাটকের জন্যে কলেজ ঝিবিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছাড়তে, চাকরির প্রমোশন ছাড়তে, চাকরি ছাড়তেও। আজকের মতো এমন দুর্বিনেয় হিসাবি ছিলেন না বোধহয় তাঁরা। থিয়েটার বলে কথা নয়, যে কোনও ক্ষেত্রে তণেরা নিজেদের মনে করতেন এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের অংশী। সাতচল্লিশ থেকে বাহ ান্তর --- সময় তারপর যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল, দেখতে না -দেখতে পাল্টে গেল -- হিসাবি ঘোড়াগুলো ছুটল সবুজ তৃণভূমির দিকে সওদাবাণিজ্য সারতে। জি আর রোজগারের প্রতিশ্রুতি না পেলে মানুষের সৃজনপ্রতিভা আজ আর ফশা তোলে না। আর পেলে, কী আশ্চর্য, যে সঙ্গে ঠাসাঠাসি ভিড়, ঠেলাঠেলি। বাংলায় নাট্যকারনেই, কিন্তু তা বলে টিভি সিরিয়ালের কলমচির কি কোনও অভাব আছে? ওদিকে যে এখন নগদ পাওনাটা ভালো। লেখাপড়া - খেলাধুলো - সম াজসেবা- রাজনীতি - শিল্পচর্চায় আগে মানুষের চিত্তবৃত্তির ভূমিকাটিকে বিশেষভাবে মানা হত। মনে করা হত, প্রকৃতিতে নিহিত লক্ষণাবৃত্তির তাড়নাতেই মানুষ এক এক দিকে ঝোঁকে। এখন এসব বিবেচনার মধ্যে নেই। মনে করা হয়, সবাই সব কিছু করতেপারে। খানিকটা টেকনিক আয়ত্ত করতে পারলেই হল। মানুষ সর্বতোভাবে বৃত্তিমুখী। যদি দেখা যায় ভিক্ষাবৃত্তি অধিক লাভজনক, সেদিকেইযে ইঁদুরদৌড় শু হবে না --- এমন ভরসা আছে কি? এমন পরিস্থিতিতে গ্রুপ থিয়েটার অ াক্ষরিক অর্থেই পাদানির মতো ব্যবহৃত। থিয়েটারের ঘাড়ে পা রেখে সিনেমা বা টিভি বা যাত্রা মোটাসোটা ডাল ধরে ঝুলে পড়া। ঝি জুড়ে বাণিজ্যের ফাঁদ পাতা। কেমন করে চলছে যে বাংলার অপেশদার নাট্যচর্চা -- ভুক্তভোগীরাই জানেন। কেমন করে চলবে যে একবিংশ শতাব্দীতে, সম্ভবত কারও জানা নেই। গত পঁচিশ বছরে বারবার খতিয়ে দেখা হয়েছে--- গ্রুপ থিয়েটারকে পেশাদার করে তোলা যায় কিনা। কেমন করে ব্যাপারটা সম্ভব, তার কোনও হদিশ দিতে পারেননি কেউ। টিভি যাত্রা সিনেমার পাশে থিয়েটার এখন মাইনরিটির কালচার। অল্পসংখ্যক মানুষের সংস্কৃতি ব্যয়ের চেয়ে অ ায়ের পরিমাণ কম। ক'টা লোকের ভরণপোষণ জোগাতে পারবে থিয়েটার? কেবল থিয়েটারে নির্ভর করে ক'জন ব্যক্তিন্য ায্যভাবে জীবন কাটিয়েছেন এ পর্যন্ত - দুশো বছরের নাট্যশালার ইতিহাসে! বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অগ্রগতি এবং আধিপত্য থিয়েটারের মূল ধরেই টান দিয়েছে বুঝি। মানুষ যে থিয়েটারে বা যাত্রায় ছোটে, তার মূলে একটা বড় আকর্ষণ -- থিয়েট ারে যাত্রায় আরও অনেকমানুষের দেখা মিলবে, মিলবে শিল্পীদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের উত্তাপও। জ্যান্ত মানুষের শারীরিক সা ন্নিধ্যের টানেই না থিয়েটারে ছোটা। বৈদুতিন সম্ভার নিশ্চিতভাবে মানুষের ঐন্দ্রিয়ক আকর্ষণের অবমর্ষ ঘটাচ্ছে, জীবনে সর্বক্ষেত্রেই ঘরে বসে ছোট পর্দায় ছায়া - অভিনয় দেখতেই ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে মানুষ--- জ্যান্ত অভিনেতার শ ারীরিক সংসর্গের টান হয়তো এখন আর উদ্বেলিত করবে না তাকে।

এই সর্বৈব অনিশ্চিতি আর অস্থিরতার মধ্যেও থিয়েটারের কাজটা কিন্তু গত পঁচিশ বছরে কিছুমাত্র কমল হল না। বরং বলব, পূর্বসূরীদের চেয়ে ঢের কঠিন আর জটিল সময়ের মোকাবিলা করে অধিকতর সাফল্য ঘরে তুলছে বাংলার থিয়েট ার, ধারে ভারে ---উভয়ত। শত হতাশার মধ্যেও তাই মেনে নিতে হয়, --- থিয়েটারের জীবনীশক্তি অনন্ত। মানতে হয়, সব হিসাবের বাইরে বাংলা জলবাতাসে এখনও অনেক বেহিসেবিপনা আছে।

স্বাধীনতা - উত্তর বাংলা থিয়েটারের দ্বিতীয়পর্বের শিল্পীসমাবেশ অতুলনীয়। বিভাস চক্রবর্তীর, অণ মুখোপাধ্যায়, দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসিত মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়--- পঞ্চাশ - ষাটের সেই দীপ্ত তণ প্রজন্ম এই পর্বে পরিণত এবং ক্ষমতার তুঙ্গে। পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত তণ মেঘনাদ ভট্টাচ র্য, রমাপ্রসাদ বণিক, উষা গাঙ্গুলি, শাঁওলি মিত্র, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, সোহাগ সেনদের উত্থানও কম চমকপ্রদ নয়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, প্রথম পঁচিশ বছরে কৃতিত্ব ছিল্ল স্বল্প কয়েকজনের, দ্বিতীয় পঁচিশে অনেকের। কে যে কখন হঠাৎ উঠে এসে স্তম্ভিত করে দেবেন,আন্দাজ করা যাচ্ছে না। দেবাশিস মজুমদার, ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী, চন্দন সেন, শেখর সমাদ্দার, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটক এবং কণিষ্কসেন, জয় সেন, দেবাশিস দাশগুপ্ত, মুরারি রায়চৌধুরী, তড়িৎ চৌধুরী, গৌতম ঘোষদের নেপথ্য শিল্পকর্ম এই পর্বের প্রাপ্তির তালিকায় সত্যি বলতে কী, একটা তুলিতে সম্ভব নয় গত পঁচিশ বছরের পূর্ণ চিত্র আঁকা।

অনেক বলেন, আমরা থিয়েটারের মানুষরাও বলি, পঞ্চাশ ষাটের দশকেই বাংলা থিয়েটার তার সোনার দিনগুলো

ফেলে এসেছে। অন্যের কথার প্রতিবাদ করব না--- তবে থিয়েটারের মানুষদের এহেন বিশ্বাসের একটা কারণ বোধহয়, আমরা নিজেরাই পঞ্চাশ-ষাটের দর্শকের মোহজালে জড়িয়ে আছি, আমরা আমাদের গড়ে ওঠার দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবেসেছি, এবং আমাদের মূল্যায়নে পরাঙ্মুখ। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী? যোগ্যতা বিচারকেরা হয়তো কোনওদিন প্রমাণ করে দেবেন ঘটমান বর্তমান দ্বারা পরাগত সমীভবন সম্ভব ছিল। পাঠকের স্মৃতি আর কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে দ্বিতীয় পর্বের বাংলা নাট্যের সামান্য কয়েকটি রাজরক্ত, মারীচ সংবাদ, পন্ত লাহা, ফুটবল, মৃচ্ছকটিক, দানসাগর, অমিতাক্ষর, নীলাম নীলাম, শোয়াইক গেল যুদ্ধে, নীলা, চাকাভাঙা মধু, গালিলেও, অসঙ্গত, যদুবংশ, রাংতার মুকুট, আখামা, আজকের শাহজাহান, মাধব মালঞ্চী কইন্যা, জল, জগন্নাথ, বেলা অবেলারগল্প, বাসভূমি, মহাকালীর বাচ্চা, মিস্টার কাকাতুয়া, তখন বিকেল, গালিলেওর জীবন, অন্তরাল, কর্ডলাইন, কামারকাহিনী, দৃষ্টিকন্যা, চৈতালি রাতের স্বপ্ন, দালি, আলিজিন, উত্তরপুষ কোর্টমার্শাল, রোশন, আলিবাবা, ফেরিওয়ালার মৃত্যু, তেত্রিশতম জন্মদিন, দায়বদ্ধ, ব্রতসন্ত্রাস, দেবাংশী, আগশুদ্ধি, কর্ণাবতী, কাচের দেওয়াল, মুষ্টিযোগ, জুলিয়াস সিজারের শেষ সাতদিন, শেষ সাক্ষাৎকার, ঘোড়া, দূরবীন, মেঘনাদবধ কাব্য, গুলশন, উত্তরাধিকার , আজকের হ য ব র ল, অশালীন, কোরিওলেনাস, নামজীবন, গন্তব্য, প্রত্যাশা,একা এবং একা, নিন্দাপঙ্কে, টিকটিকি, কালকাতার হ্যামলেট, আকরিক, রাণীকাহিনী, রস, দর্পণে শরৎশশী, আত্রমণ, গোত্রান্তর, নাথবতী অনাথবৎ, খেলাঘর, চিরকুমার সভা, বলিদান ....।

শুধু নাট্যপ্রযোজনায় নয়, দ্বিতীয় অধ্যায় বিশিষ্ট হয়ে থাকবে নাট্য উন্নয়নে বেশ কয়েকটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক উদ্যোগের কারণে। পঞ্চাশে ষাটেই অনুভব করা গিয়েছিল অশিক্ষিত পটুত্বে থিয়েটার হবার নয়। কথাটাই ঘুরত সে সময়, নাট্য প্রশিক্ষণেরকোনও প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত দেখা যায়নি। গত পঁচিশ বছরে সর্বাধিক গুত্ব পেয়েছে নাট্য প্রশিক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অবদান এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য। তবে অপেক্ষাকৃত সীমিত সাধ্যে নান্দীকার, অন্য থিয়েটার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ এবং অন্যদের প্রচেষ্টাও কম ফলপ্রসূ হয়নি। সত্তর দশকের শেষ দিকে দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে নান্দীকার শুরু করে বাংলার অপেশদার থিয়েটারের, যাকে বলে ভিন্ন জাতের থিয়েটারের সামাজিক - অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রসমীক্ষা। পিছিয়ে থাকা স্কুলের ছেলেদের নিয়ে প্রযোজনা - ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবিরও চালিয়েছে নান্দীকার, প্রতিবন্ধীদেরও ডেকে এনেছে থিয়েটারে। দ্রপ্রসাদের নান্দীকার বিগত তেরো বছর ধরে আয়োজন করেছে জাতীয় নাট্যোৎসবের। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সারা দেশের থিয়েটারের পরিচয় গড়ে দিয়েছে নান্দীকারের জাতীয় নাট্যোৎসব। উচচতর নাট্যগবেষণার ক্ষেত্রে তেমনই প্রতিভা অগ্রবালের নাট্যশোধ সংস্থান পশ্চিমবাংলা থিয়েটারের স্থায়ী সম্পদ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান এই পর্বের বাংলা নাট্যের মানচিত্রটাকে প্রসারিত করেনি কেবল, তার মানমর্যাদা, ঐর্যও বাড়িয়েছে বহুগুণ। সেলিম আলদীন, আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, রামেন্দু মজুমদার, নাসিরউদ্দিন, জামালউদ্দিন, আবদুল্লা আর মামুন, আলি জাকেরদের নাট্যকৃতি যোগ করে নিলে বাংলা নাট্যের অখণ্ড সমগ্র মূর্তিটা নিঃসন্দেহে সমারোহপূর্ণ, বিস্ময়কর। এইসববৃহৎ ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকর্মীদের ছোট্ট নম্র একটি কল্যাণমূলক উদ্যোগের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণকরব। বছর ছয়েক আগে কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে 'নাট্যসংহতি' নামে এক প্রতিষ্ঠান--- বিপদে আপদে নাট্যকর্মীদের অর্থ সাহায্য করাই যার লক্ষ্য।

।। চার ।।

গত পঞ্চাশ বছরে নিদ্দেশের তালিকায় বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়।

স্টার থিয়েটার ভস্মীভূত, মিনার্ভায় তালা, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে ধুলো, বিরূপা অন্ধকার।

স্টারের সলিল মিত্রদের মতো চিবান প্রযোজকরা সরে যেতে, কিছু লোভী চতুর মুনাফাখোরদের পাল্লায় পড়ে কুৎসিত কাণ্ডকারখানার আখড়া হয়ে উঠেছিল সাধারণ রঙ্গালয়গুলি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায়দের মতো কয়েকজনের চেষ্টায় হৃত সম্মান উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি?

শিশিরকুমার ভাদুড়ির আশঙ্কাই বুঝি সত্য হয়, দেশবাসী না বাঁচলে লুপ্ত হয়ে যাবে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যসংস্কৃতি।

হারানো প্রাপ্তি নিদ্দেশ